**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের**

**জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ ফিচার**

**জুলিও কুরি বঙ্গবন্ধু**

­সুভাষ সিংহ রায়

১৯৭৩ সালের ২৩ মে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের উত্তর প্লাজায় উন্মুক্ত চত্বরে সুসজ্জিত প্যান্ডেলে বিশ্ব শান্তি পরিষদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক কূটনীতিদের বিশাল সমাবেশে বিশ্ব শান্তি পরিষদের তৎকালীন মহাসচিব রমেশ চন্দ্র বঙ্গবন্ধুকে ‘জুলিও কুরি’ শান্তি পদক প্রদান করেন। এরপর তিনি বলেন, ‘শেখ মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধু নন, আজ থেকে তিনি বিশ্ব বন্ধুও বটে।’

বঙ্গবন্ধুর আগে যারা ‘জুলিও কুরি’ শান্তি পদক লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-ফিদেল ক্যাস্ট্রো, হো চি মিন, ইয়াসির আরাফাত, সালভেদর আলেন্দে, নেলসন ম্যান্ডেলা, ইন্দিরা গান্ধী, মাদার তেরেসা, কবি ও রাজনীতিবিদ পাবলো নেরুদা, জওহরলাল নেহেরু, মার্টিন লুথার কিং, নিওনিদ ব্লেজনভ প্রমুখ। আমরা জানি , মারি কুরি ও পিয়েরে কুরি ছিলেন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী। রেডিওলজির ওপর উইলিয়াম রঞ্জেনের আবিষ্কারের পথ ধরে কুরি দম্পতি তাদের গবেষণা চালিয়ে যান এবং পলোনিয়াম ও রেডিয়ামের মৌল উদ্ভাবন করেন। তাদের উদ্ভাবন পদার্থবিদ্যায় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। বিশ্ব শান্তির সংগ্রামে এই বিজ্ঞানী দম্পতির মহান অবদান চিরস্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে বিশ্ব শান্তি পরিষদ ১৯৫০ সাল থেকে ফ্যাসিবাদবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে, মানবতার কল্যাণে শান্তির স্বপক্ষে বিশেষ অবদানের জন্য বরণীয় ব্যক্তি ও সংগঠনকে জুলিও কুরি শান্তি পদকে ভূষিত করে আসছে। জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রদান অনুষ্ঠানে ভারতের ৩৫ জন প্রতিনিধির নেতা কৃষ্ণ মেনের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা জন রিড উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আগে যারা জুলিও কুরি শান্তি পদক লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-ফিদেল ক্যাস্ট্রো, হো চি মিন, ইয়াসির আরাফাত, সালভেদর আলেন্দে, নেলসন ম্যান্ডেলা, ইন্দিরা গান্ধী, মাদার তেরেসা, কবি ও রাজনীতিবিদ পাবলো নেরুদা, জওহরলাল নেহেরু, মার্টিন লুথার কিং, নিওনিদ ব্লেজনভ প্রমুখ। ঢাকায় অনুষ্ঠিত ওই এশীয় শান্তি সম্মেলনের ঘোষণায় এই উপমহাদেশে শান্তি ও প্রগতির শক্তিগুলোর অগ্রগতি নিশ্চিত করে।

বাংলাদেশের অভ্যূদয়ের পর বিশ্ব শান্তি ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত বঙ্গবন্ধুকে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সর্বোচ্চ পুরস্কার ‘জুলিও কুরি’ শান্তি পদক প্রদান এক বিরল ঘটনা। বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন বিশ্ব পরিস্থিতি, শান্তি, প্রগতি, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর এবং গণতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অনুকূলে পরিবর্তিত হয়েছিল এ সময় উপমহাদেশে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের ভেতর সৎ প্রতিবেশীমূলক সম্পর্ক স্থাপন ও উপমহাদেশে শান্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়। মুক্তিযুদ্ধের কালপর্বে ভারত-সোভিয়েত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা-চুক্তি ১৯৭১ এবং বাংলাদেশ-ভারত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা-চুক্তি ১৯৭২, বাংলাদেশের মৈত্রী-সম্পর্কে এই উপমহাদেশে উত্তেজনা প্রশমন ও শান্তি স্থাপনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল।

পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিপরীতে বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক জোট নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ এবং শান্তি ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান গ্রহণের নীতির ফলে বাংলাদেশ বিশ্ব সভায় একটি ন্যায়ানুগ দেশের মর্যাদা লাভ করে। সবার প্রতি বন্ধুত্বের ভিত্তিতে বৈদেশিক নীতি ঘোষণা করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ‘পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তি যে অর্থ ব্যয় করে মানুষ মারার অস্ত্র তৈরি করছে, সেই অর্থ গরিব দেশগুলোকে সাহায্য দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে।’

সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে বিশ্ব শান্তি পরিষদের প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটির সভায় বাঙালি জাতির মুক্তি আন্দোলন এবং বিশ্ব শান্তির সপক্ষে বঙ্গবন্ধুর অবদানের স্বীকৃতিসরূপ ‘জুলিও কুরি’ শান্তি পদক প্রদানের জন্য শান্তি পরিষদের মহাসচিব রমেশ চন্দ্র প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। পৃথিবীর ১৪০ টি দেশের শান্তি পরিষদের ২০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘জুলিও কুরি’ শান্তি পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধুকে ‘জুলিও কুরি’ শান্তি পদকে ভূষিত করার পেছনে বাংলাদেশ শান্তি পরিষদের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আলী আকসাদেরও যথেষ্ট ভূমিকা ছিল।

ওই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালের মে মাসে এশিয়ান পিস এন্ড সিকিউরিটি কনফারেন্স অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে শান্তি পরিষদ ঢাকায় দুই দিনব্যাপী এক সম্মেলনের আয়োজন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিশ্ব শান্তি পরিষদের শাখাগুলোর বহু প্রতিনিধি এই সভায় মিলিত হন। এসব প্রতিনিধি ছাড়াও আপসো, পিএলও, এএমসি সোয়াপো ইত্যাদি সংস্থার অনেকে প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক জোট নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ এবং শান্তি ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান গ্রহণের নীতির ফলে বাংলাদেশ বিশ্ব সভায় একটি ন্যায়ানুগ দেশের মর্যাদা লাভ করে। সবার প্রতি বৈদেশিক নীতি ঘোষণা করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ‘পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তি যে অর্থ ব্যয় করে মানুষ মারার অস্ত্র তৈরি করছে, সেই অর্থ গরিব দেশগুলোকে সাহায্য দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে।’

-২-

সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে বিশ্ব শান্তি পরিষদের প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটির সভায় বাঙালি জাতির মুক্তি আন্দোলন এবং বিশ্ব শান্তির সপক্ষে বঙ্গবন্ধুর অবদানের স্বীকৃতিসরূপ ‘জুলিও কুরি’ শান্তি পদক প্রদানের জন্য শান্তি পরিষদের মহাসচিব রমেশ চন্দ্র প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। পৃথিবীর ১৪০ টি দেশের শান্তি পরিষদের ২০০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে ‘জুলিও কুরি’ শান্তি পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

শান্তি পরিষদের ওই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালের মে মাসে এশিয়ান পিস এন্ড সিকিউরিটি কনফারেন্স অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশ্ব শান্তি পরিষদ ঢাকায় দুই দিনব্যাপী এক সম্মেলনের আয়োজন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিশ্ব শান্তি পরিষদের শাখাগুলো বহু প্রতিনিধি এই সভায় যোগ দেন। এসব প্রতিনিধি ছাড়াও আপসো, পিএলও, এএমসি সোয়াপো ইত্যাদি সংস্থার অনেকে প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিল।

অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন ২৩ মে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের উত্তর প্লাজায় উন্মুক্ত চত্বরে সুসজ্জিত প্যান্ডেলে বিশ্ব শান্তি পরিষদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক কূটনীতিদের বিশাল সমাবেশে বিশ্ব শান্তি পরিষদের তৎকালীন মহাসচিব রমেশ চন্দ্র বঙ্গবন্ধুকে ‘জুলিও কুরি’ শান্তি পদক প্রদান করেন। এরপর তিনি বলেন, ‘শেখ মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধু নন, আজ থেকে তিনি বিশ্ব বন্ধুও বটে।’

উপমহাদেশের শান্তি ও প্রগতি সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছিল দেশে-বিদেশে তাঁর বিভিন্ন বিবৃতিতে। ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে কলকাতায় তাঁর সম্মানে প্রদত্ত নাগরিক সংবর্ধনায় তিনি পাকিস্তানের প্রতি দৃষ্টি রেখে বলেছিলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি না প্রতিশোধ গ্রহণে কোনো মহৎ কর্তব্য পালন করা যায়।’ ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি, সন্ধ্যায় কলকাতার রাজভবনে তাঁর সম্মানে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রদত্ত ভোজসভায় তিনি একটি ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আমার একান্ত কামনা, উপমহাদেশে অবশেষে শান্তি ও সুস্থিরতা আসবে। প্রতিবেশীদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতার বন্ধ্যা নীতির অবসান হোক। আমাদের জাতীয় সম্পদের অপচয় না করে আমরা যেন তা আমাদের দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্যবহার করি। দক্ষিণ এশিয়াকে একটি শান্তিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত করায় আমরা সচেষ্ট রইব, যেখানে আমরা সুপ্রতিবেশী হিসেবে পাশাপাশি বাস করতে পারি এবং যেখানে আমাদের মানুষের মঙ্গলার্থে আমরা গঠনমূলক নীতিমালা অনুসরণ করতে পারি। যদি আমরা সেই দায়িত্বে ব্যর্থ হই, ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।’ উপমহাদেশের উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে, যখন রণাঙ্গণ থেকে রক্তের দাগও মুছে যায়নি, আঞ্চলিক সহযোগিতা বিকাশের এই উদাত্ত আহবান, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের একজন রাষ্ট্রনায়কের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আর পরিপক্কতার পরিচায়ক দেশে বঙ্গবন্ধু করেছিলেন একই কথার পুনরাবৃত্তি। ১৯৭৪ সালের মার্চের ৪ তারিখে তিনি কুমিল্লার দাউদকান্দিতে এক জনসভায় বলেছিলেন, ‘এই উপমহাদেশে আমরা বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল আর শ্রীলঙ্কা মিলে শান্তিতে বসবাস করতে চাই। আমরা কারও সঙ্গে বিবাদ চাই না। আমরা স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে, আত্মমর্যাদার সঙ্গে একে অন্যের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে বাস করতে চাই। আমি চাই না যে আমাদের বিষয়াদিতে কেউ হস্তক্ষেপ করুক। আমরাও অন্যের বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী নই।’ ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসেই বার্মার (বর্তমানের মিয়ানমার) সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের জন্য বঙ্গবন্ধু সেই দেশে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। সেই দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন সেই সময়ে রেঙ্গুনে (বর্তমান ইয়াঙ্গুন) বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত খাজা কায়সার। প্রতিনিধি দলটির সদস্যদের মধ্যে ছিলাম আমি, সেই সময়ের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার হারুনুর রশিদ আর চিফ হাইড্রোগ্রাফার আবু হেনা। সেটাই ছিল মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সমঝোতার প্রথম পদক্ষেপ। আমরা এখন সবাই জানি, বঙ্গবন্ধু সমুদ্র আইন করেছিলেন ১৯৭৪ সালে আর জাতিসংঘ তা করেছে ১৯৮২ সালে । বঙ্গবন্ধু’র ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৃজনশীল কুটনৈতিক দক্ষতায় ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধের নিস্পত্তি করেছেন । বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার আরেক অনন্য সাধারণ উদাহরণ।

১৯৭৫ সালের মে মাসে জ্যামাইকার কিংস্টনের কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে তাঁর একক প্রচেষ্টায়। সেই সম্মেলনের যুগ্ম ইশতেহারের ১৪ অনুচ্ছেদ রয়েছে একটি ঘোষণা। তাতে বলা হয়েছে যে কিছু অমীমাংসিত সমস্যার জন্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কষ্টের সৃষ্টি হয়েছে, হয়েছে জাতীয় পুনর্গঠনের গতি শ্লথ। তার মধ্যে রয়েছে ‘মানুষের স্বদেশ পুনঃপ্রেরণ এবং সম্পত্তির বাঁটোয়ারা’। সেই ঘোষণায় কমনওয়েলথ সরকারপ্রধানেরা আশা করেন যে ‘সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর’ মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যাবলির সমাধান ঘটবে।

এই ধরনের একটি প্রস্তাব পাস করানো ছিল বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের অভিপ্রায়। পাকিস্তানের কূটনীতিবিদদের প্রতি ভুট্টোর আদেশ ছিল যে বাংলাদেশের এই উদ্যোগ বানচালের যেন সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হয়। সেই উদ্দেশ্যে কিংস্টনে এসেছিল কানাডায় পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইফতেখার আলী। বাংলাদেশে ভুট্টোর সফর সম্বন্ধে তিনি অন্য সরকারপ্রধানদের জ্ঞাত করা এবং বাংলাদেশের শান্তিপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া ।বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই জ্যামাইকার প্রধানমন্ত্রী মাইকেল ম্যানলি বললেন যে তাঁর মতে, যুগ্ম ইশতেহারে বাংলাদেশের বক্তব্যটি ব্যক্ত হওয়া উচিত এবং কী ব্যক্ত হবে তার একটি খসড়া যেন বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল প্রণয়ন করে। স্বাগতিক দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মাইকেল ম্যানলি ছিলেন সেই সম্মেলনের সভাপতি। তাঁর বক্তব্যের গুরুত্ব তাই ছিল অনেক। সেই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই বক্তব্য প্রদান করলেন হ্যারল্ড উইলসন। তিনি বললেন যে বাংলাদেশের দাবি ব্রিটেন সর্বান্ত:করণে সমর্থন করে। তাঁর ভাষায়, ইতিহাসের এমন কোনো নজির নেই যে দুই জাতিতে পরিণত রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পত্তির যথাযথ বাঁটোয়ারা হয়নি। (‘No precedent in history when a country separated into two nations and the assets were not equitbly shared.’)

-৩-

শুধু বাদ সাধলেন তানজানিয়ার জুলিয়াস নায়েরেরে। তাঁর বক্তব্য, তিনি বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল। তবে কমনওয়েলথ একটি ক্লাব। পাকিস্তান তার সদস্য নয়। অতএব এই ক্লাবটির কি উচিত হবে সেই দেশকে জড়িয়ে কোনো প্রস্তাব পাস করা? বোঝা গিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য আর মাইকেল ম্যানলি ও হ্যারল্ড উইলসনের সমর্থন বঙ্গবন্ধুর সপ্তাহ শেষের পরিকল্পনা উদ্ভূত। উপস্থিত সবাই উৎকন্ঠিত হয়েছিলেন এই ভেবে বঙ্গবন্ধু’র সেই প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু কী বলবেন জুলিয়াস নায়েরেরের কথার জবাবে। বঙ্গবন্ধু চোখ থেকে তাঁর কালো ফ্রেমের চশমাটি অপসরণ করে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন জুলিয়াস নায়েরেরের দিকে।

তারপর বললেন, ‘তুমি ঠিকই বলছ, জুলিয়াস। কমনওয়েলথ একটি ক্লাব। কিন্তু আমি সেই ক্লাবেরই একজন সদস্য। অন্য সদস্যরা যদি সামান্য একটি প্রস্তাব পাস করে আমাকে সাহায্য না করেন, তাহলে এই ক্লাবের সদস্য হওয়ার আমার কিই বা প্রয়োজন ছিল? একটি দরিদ্র দেশের রাষ্ট্রপ্রধান আমি। কেন তবে আমি অর্ধেক পৃথিবী পেরিয়ে এসেছি এই সম্মেলনে?’অখন্ডনীয় যুক্তি। হতবাক জুলিয়াস নায়েরেরে। হেসে বললেন, ‘ঠিক আছে, মুজিব। তুমি যা চাও, তা-ই হবে।’ বঙ্গবন্ধু আজ উপস্থিত না থাকলেও তার মহান আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং তার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আছে। বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বেঁচে আছেন, চিরকাল বেঁচে থাকবেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তির বার্তা নিয়ে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি পৃথিবীর বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে চলছে।

২০১৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ‘ প্রজেক্ট সিন্ডিকেট ’ এ প্রকাশিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখা দৈনিক প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার এ ছাপা হয়েছিল । প্রজেক্ট সিন্ডিকেটের এই লেখাটি ১৫৫ টি দেশে ১৩ টি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল । এই প্রতিষ্ঠানটির সারা পৃথিবীতে ৪৫৯ টি মিডিয়া আউটলেট রয়েছে এবং বাংলাদেশের শুধু উল্লেখিত দু’টি পত্রিকার সাথে চুক্তি রয়েছে । প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখার শিরোনাম ছিল ‘অভিবাসন ব্যবস্থাপনা সঠিক হতে হবে ’ । লেখার কয়েকটি গুরুত্ব লাইন এ পরিসরে উপস্থাপন করছি । ‘‘গন্তব্যে পৌঁছাতে গিয়ে ৪ হাজার ৩০০ জনেরও বেশি অভিবাসীর মৃত্যু হয়েছে। কেবল ভূমধ্যসাগরেই প্রাণহানি হয়েছে ৩ হাজার ২০০ মানুষের। আর বঙ্গোপসাগরের ঠিক পূর্বে আন্দামন সাগরে হাজারো অভিবাসী কোথাও ভিড়তে না পেরে নৌকায় আটকে থেকেছে অথবা পাচারকারীদের হাতে জিম্মিদশায় পতিত হয়েছে।...এই প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের সদস্য-সরকারগুলোর উচিত গত বছর যেসব উচ্চাশার প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছিল, তার সঙ্গে বাস্তবতার ব্যবধান এবং বহু অভিবাসী যে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এ মাসের অধিবেশনে, বিশেষত অভিবাসন ও শরণার্থী বিষয়ে এই অভূতপূর্ব সম্মেলন বিশ্ব নেতারা এই দায় মেটাতে পারেন।....

....নীতিনির্ধারকদের উচিত অভিবাসনের অর্থনৈতিক সুফল সর্বোচ্চকরণে কাজ করা; অভিবাসীরা যাতে বেআইনি বিকল্পের দিকে পা না বাড়ায়, তার জন্য আইনি পথ প্রশস্ত করা। উচিত কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রার বাধা কমিয়ে আনা; অনিয়মিত অভিবাসন প্রবাহকে সামলানো এবং এ বছর যেমনটা হয়েছে; বিশেষত যুদ্ধাঞ্চলে অথবা যখন অভিবাসন সংকটজনক পর্যায়ে চলে আসে, তখন অভিবাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি।’’

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন ।

#

২০.০৫.২০২০ পিআইডি ফিচার

সুভাষ সিংহ রায় : রাজনৈতিক বিশ্লেষক